OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 506 - 513
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 506 - 513
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

শ্রী অরবিন্দ ও তাঁর পূর্ণযোগ : একটি সম্যক্ দার্শনিক বিশ্লেষণ

ড. রুবি দাস (চক্রবর্ত্তী)
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ
হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজ, মালদা
Email ID : rubichakraborty84@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Śrī Aurobindo, Yoga Philosophy, Advaita Vedānta, Samādhis, Pūrṇayoga, Divine Life, Indian Philosopher, Spiritual Philosophy, Integral Yoga.

Abstract
Śrī Aurobindo's philosophy is influenced by ancient Indian philosophers, particularly Yoga philosophy and Advaita Vedānta. He reorganized and reanalyzed these philosophical thoughts, initiating a new coherent way of thinking. Yoga, a significant Indian spiritual philosophy, is derived from Maharṣi Patañjali who did not use the term 'yoga' in a general sense. Instead, he defined yoga as 'attachment to the Divine Being', which can be transcendental, mundane, or deeply personal.

Śrī Aurobindo's Pūrṇayoga or Integral Yoga aims to initiate divine life on earth through the restoration of the entire human race. Pūrṇayoga is not possible through Rājayoga, Haṭhayoga, Karmayoga, Jñānayoga, or Bhaktiyoga, as they have limitations and not infinite potential. Pūrṇayoga is governed by the will of the benevolent divine power, and a person who attains inner life by being introverted can only control external consciousness and attain inner silence on the path of Pūrṇayoga. This allows them to break through the barriers of narrowness and pass into the divine life.

Discussion

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে আজ থেকে ৭৫ বছর আগে। বহু দীর্ঘদিনের বহু দেশ প্রেমিকের আত্মদানের ফলে স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হয়েছে। বহু দল বহু ব্যক্তি এই স্বপ্নকে সফল করার জন্য কত অমানুষিক বেদনা আর ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন। অরবিন্দ ঘোষ হলেন এমনই একজন মানুষ যার চেষ্টা আর সাধনায় এই আন্দোলন পরিপুষ্ট হয়েছে। যার নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়ে জাতি আজ এই স্বাধীনতার পথ খুঁজে পেয়েছে। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সেনাপতি এবং আজকে যে ভারতবর্ষ নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি, তিনি হলেন তার আদি স্রষ্টা। তাঁর অসাধারণ চরিত্র আর সাধনা থেকে বর্তমান ভারত বর্ষ নিজের উপযুক্ত মর্যাদার সন্ধান পেয়েছে। তিনি যে সাধনায় মগ্ন ছিলেন, তাঁর উত্তরসূরীরা যদি সেই সাধনার পথ অবলম্বন করে তাহলে ভারত বর্ষ স্থায়ী কল্যাণের পথ খুঁজে পাবে। আমাদের জীবন বড় বিচিত্র। শ্রী অরবিন্দের

জীবনের মধ্যে দিয়ে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে আমাদের দৃষ্টির উর্ধ্বে এক বিরাট শক্তি আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন।

১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট অরবিন্দ ঘোষের জন্ম হয় কলকাতার থিয়েটার রোডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পিতা হলেন কৃষ্ণধন ঘোষ ও মাতা হলেন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতা দেবী। অরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ চেয়েছিলেন তাঁর ছেলেরা ছেলেবেলা থেকেই যাতে ইংরেজি শিক্ষা আর ইংরেজি সভ্যতা আয়ত্ত করতে পারে। তার জন্য তিনি শিশু অরবিন্দকে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে দার্জিলিং এর লরেটো কনভেন্স স্কুলে ভর্তি করে দেন। সেখানে সাহেব ছেলেদের সঙ্গে অরবিন্দ দু বছর পড়াশোনা করেন।

এরপর কৃষ্ণধন ঘোষ শিশু অরবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে বিলাতে চলে যান এবং এক সম্ভ্রান্ত খ্রিস্টান পরিবারে অরবিন্দকে রেখে স্বদেশে ফিরে আসেন। সেখানে বিলাতি আবহাওয়ার মধ্যে এক খ্রিস্টান পরিবারের থেকে ইংরেজ শিশুদের সঙ্গে অরবিন্দ মানুষ হতে থাকেন। যখন রংপুরে সিভিল সার্জন ছিলেন তখন সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন গ্লেজিয়ার সাহেব। এই গ্লেজিয়া সাহেবের এক আত্মীয় ইংল্যান্ডের ছিলেন, তার নাম এক্রয়েড। কৃষ্ণ ধন ঘোষ গ্লেজারের পরিচয় এই এক্রয়েড পরিবারে শিশু অরবিন্দকে দেখে আসেন। এই খ্রিস্টান পরিবারের সঙ্গে অরবিন্দ এতখানি এক হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি তার নামের সঙ্গে এক্রয়েড নামও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নাম স্বাক্ষর করবার সময় লিখতেন এক্রয়েড এ. ঘোষ। সেখানে শিশু অরবিন্দ প্রথমে ম্যানচেস্টারের এক গ্রামে স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে পাঁচ বছর পড়ার পর অরবিন্দ লন্ডনের সেন্ট পল্স স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের পড়বার সময় থেকেই তা তাঁর প্রতিভার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মেধা দেখে স্কুলের শিক্ষকরা মুগ্ধ হয়ে যান। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় তিনি 40 পাউন্ডের বৃত্তি পান এবং কেমব্রিজের কিংস কলেজে ভর্তি হয়। যখন তাঁর 18 বছর বয়স সেই সময় তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় সগৌরবের উত্তীর্ণ হন। ল্যাটিন ও গ্রিক সাহিত্য বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। আইসিএস পরীক্ষায় যারা পাস করেন তারাই ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ভারতবর্ষে আসেন অরবিন্দ সেই উচ্চ রাজ পদের অধিকারী হয়েছিলেন। তখন আইসিএস পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রদের ঘোড়ায় চড়ার একটি পরীক্ষা দিতে হত। শ্রী অরবিন্দ যখন ঘোড়ায় চড়তে গেলেন তখন তিনি হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা বাধা পেলেন সেই বাধা তার সমগ্র জীবনের ধারা পরিবর্তন করে দিয়েছিল সেই বাধার বিচলিত হয়ে অরবিন্দ ঘোড়ায় চড়তে সক্ষম হলেন না। তিনি সেই অল্প বয়সেই বুঝলেন যখন তার ভেতর থেকে এই বাধা এসেছে তখন নিশ্চয়ই ভাগ্য বিধাতা তার জন্য অন্য কোন কিছু ভেবেছেন। কোনোদিনই তাঁর মনে অর্থ বা যশের প্রতি কোন লোভ ছিল না। এত কঠোর পরিশ্রমের পর ম্যাজিস্ট্রেট উচ্চ পদ ও অর্থ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলে স্বভাবতই যে কোন মানুষ বিচলিত হয়ে পড়েন। ছাত্র অবস্থায় তাকে বহুদিন বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর বাবা নিয়মিত তাকে অর্থ পর্যন্ত পাঠাতে পারতেন না। কারণ তিনি অত্যান্ত বেহিসাবি ভাবে খরচে লোক ছিলেন, তার জন্য তাঁর শেষ জীবনে বহু অর্থ কষ্ট সহ্য করতে হয়। এমনকি ছেলেদের কাছে তখন নিয়মিত টাকা পাঠাতেও পারতেন না। সেই সময় অরবিন্দকে কখনো কখনো অনশনেও দিন কাটাতে হয়েছে। এত কষ্ট সাধনার পরেও যখন তিনি উচ্চ রাজপদ থেকে বঞ্চিত হলেন তখনো বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। সেই সময় বরদার মহারাজা লন্ডনে ছিলেন। তিনি তরুণ অরবিন্দের প্রতিভা ও মেধার কথা শুনে তাকে নিজের স্টেটে চাকরি দিতে রাজি হলেন এবং অরবিন্দ বিলাত থেকে বরদার শিক্ষা বিভাগে চাকরি নিয়ে চলে এলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল তখন তার বাবা কৃষ্ণ ধন ঘোষ পরলোক গমন করেছেন।

বরদায় ফিরে এসে অরবিন্দ পড়াশোনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। যে যুবক শৈশব থেকে বিলেতে কাটিয়ে এসেছে তাঁর কথাবার্তা, হাবভাব, পোষাক, পরিচ্ছদের মধ্যে বিলেতি সভ্যতার কোন উগ্রভাব কিন্তু দেখা গেল না। সাধারণ পোশাক ও অতি সাধারণ লোকের মত তিনি নিজের ভাব রাজ্যে বিচরণ করতেন। বিলাতে পড়াশোনা করবার সময় তিনি বহু ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন। আর ল্যাটিন ভাষায় তার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। এরপর তিনি ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। ইংরেজি ভাষার উপর তার দখল দেখে অনেক ইংরেজ সমালোচকও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সেই সময় মাতৃভাষা বাংলা ও ভারতের সভ্যতার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি একজন একনিষ্ঠ ছাত্রের মতন সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করলেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্র বেদ উপনিষদ পড়তে পড়তে তার অন্তরে এক দিব্য জ্ঞানের

উদ্ভব ঘটল। বেদ আর উপনিষদের ভেতর তিনি দেখতে পেলেন ভারতীয় সাধনার অবিনাশী ঐশ্বর্য। তিনি উপলব্ধি করলেন ভারতের প্রাচীন সাধনার মধ্যে এমন একটা ঐশ্বর্য আছে যে আজ ভারতবর্ষকে নতুন করে আয়ত্ত করতে হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে ভারতবর্ষ সেই সাধনার কথা ভুলে গেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সেই মোহ দূর করে ভারতের সেই মূল সাধনার দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। এই মহৎ দায়িত্ব তিনি নিজে বেছে নিলেন এবং সেই কাজের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন। শৈশব থেকে বিলাতে মানুষ হওয়ার কারণে তিনি নিজের মাতৃভাষার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন না বিভিন্ন ভাষা জানলেও মাতৃভাষা না জানলে মনে একটা মস্ত বড় অতৃপ্তি থেকে যায়। তাই অরবিন্দ মাতৃভাষা ভালো করে আয়ত্ত করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। বাংলা ভাষা আয়ত্ত করার ফলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য পড়ে তার অন্তরের আর একটা দিকের দরজা যেন খুলে গেল, স্বদেশের পরাধীনতা তার অন্তরকে বিদ্ধ করতে লাগল। তিনি প্রাচীন ভারতের যে গৌরবময় সাধনার যুগ ফিরিয়ে নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখেছিলেন, পরাধীন দেশে যে তা সম্ভব নয় তা তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন। তার জন্য আগে দেশকে স্বাধীন করতে হবে। বিদেশি ইংরেজদের শৃংখল থেকে দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করতে হবে।

তখন ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই সামান্য রাজনৈতিক চেতনা জেগেছিল। একমাত্র বাংলাদেশে বাংলা ভাষার কবি আর সাহিত্যিকরা নানাভাবে দেশের গৌরবের কথা আলোচনা করছিলেন, দেশের পরাধীনতার বেদনা সম্বন্ধে দেশবাসীকে সজাগ করে তোলবার চেষ্টা করছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে দু-একজনের মনে তখন সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের সাহায্যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে। এই সময় অরবিন্দ বড়দার উচ্চ মাইনের চাকরি ত্যাগ করে বাংলাদেশে এসে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভার নিলেন। তখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হাতে বিশেষ টাকা নেই। যেসব অধ্যাপক সেই নতুন শিক্ষায়তনে যোগদান যোগদান করলেন তারা স্বেচ্ছা দারিদ্রকে বরণ করে নিয়েছিলেন। অরবিন্দ নিজেও স্বেচ্ছায় দারিদ্রকে বরণ করে নিয়েছিলেন। নামমাত্র মাইনে নিয়ে তিনি বড়দার উচ্চ রাজপদ চিরকালের জন্য ত্যাগ করে দিয়েছিলেন। বরদায় তিনি তখন প্রায় ৮০০ টাকা বেতন পেতেন। সেই জায়গায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বেতন ছিল মাত্র দেড়শ টাকা। বড়দার মহারাজ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি ফিরে যেতে চাইলেন না। তিনি নিজেকে সমগ্রভাবে দেশ সেবায় নিযুক্ত করলেন।

দেশের মধ্যে জাতীয়তার নববাণী প্রচার করার জন্য তিনি লেখনি ধারণ করলেন। বন্দেমাতারাম নাম দিয়ে ইংরেজিতে তিনি একখানি কাগজ বার করলেন। এই কাগজে তিনি সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আদর্শ হল পূর্ণ স্বাধীনতা। তার লেখার মধ্যে দিয়ে তিনি নির্ভীকভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় জাতীয়তার বাণী প্রচার করতে শুরু করলেন। সেই সমস্ত রচনা পড়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের প্রত্যেক জায়গার লোক এক নতুন উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ফলে ইংরেজদের দৃষ্টি পড়ল বন্দেমাতারাম পত্রিকার ওপর বন্দেমাতরম এর সম্পাদক হিসাবে শ্রী অরবিন্দ বন্দী হলেন। কিন্তু শেষ অব্দি উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তিনি মুক্তি ও পেয়ে গেলেন। খবরের কাগজে জাতীয়তারন বাণী প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ গুপ্ত সমিতি গঠনের কাজেও অগ্রসর হলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভাই বারীন্দ্র কুমারের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের এক গোপন দল গঠিত হল। অরবিন্দ ছিলেন সেই দলের গুরু, পরামর্শদাতা ও অধিনায়ক। মানিকতলার কাছে তাদের এক বাগানবাড়ি ছিল সেই বাগান বাড়ির ভেতর এই গুপ্ত সমিতির প্রধান আড্ডা হল এবং সেখানে বোমা তৈরি হতে লাগলো। তখন প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কিংসফোর্ট সাহেব। কিংসফোর্ড সাহেব যেমন স্বদেশীদের পছন্দ করতেন না ঠিক তেমনি কিংসফোর্ডের ওপরও স্বদেশীরা বিরূপ হয়ে উঠেছিল। স্বদেশীরা কিংসফোর্ডকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু ভাগ্যক্রমে কিংসফোর্ড বেঁচে গেলেন এবং ক্ষুদিরাম পুলিশের হাতে ধরা পরল। তখন পুলিশ সারাদেশ জুড়ে তল্লাশি শুরু করে দিলো এবং মানিকতলার বোমার আড্ডার সন্ধান পেয়ে গেল। সেই সূত্রে পুলিশ অরবিন্দকে গ্রেফতার করলো। তারপর শুরু হল আলিপুরের আদালতে সেই ঐতিহাসিক মামলার অধিবেশন। ৫ই মে তিনি আলিপুর কারাগারে হাজত বাস করতে প্রবেশ করেন আর তা ঠিক এক বছর পরে অর্থাৎ পরের বছরের ৫ই মে তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হন। এই এক বছর সময় তাকে অপরাধী আসামির মতন হাজতে বাস করতে হয়। তিনি যে কারাগারে বন্দী ছিলেন তার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৯ ফুট আর প্রস্থে মাত্র পাঁচ ফুট ছিল। এই অল্প জায়গায় কোন জানালা ছিল না বা ঘরের মধ্যে

কোন আসবাবপত্র ছিল না। তার সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেখানেই সারতে হত। এই অবস্থার মধ্যে শ্রী অরবিন্দ তার জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্তের দর্শন পেয়েছিলেন। এত বিরূপ অবস্থার মধ্যেও তিনি যোগের সাহায্যে তার মনকে এমন সংযত আর সংহত করেছিলেন যে কারাগারের সেই বন্ধপ্রাচীর তার মনের দৃষ্টির সামনে থেকে সরে গিয়েছিল। সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি গভীর ধ্যানে দিন কাটাতো, শ্রী অরবিন্দ তাঁর কারা জীবনে এক মহাসত্যের উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

শ্রী অরবিন্দের হয়ে তখন মামলা লোক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস সেই সময় কারাগারে অরবিন্দের নিজের জীবনে লোক চক্ষুর অন্তরালে এক অদ্ভুত মহা পরিবর্তন ঘটেছে। কারাগারে পড়বার জন্য তিনি বই চেয়েছিলেন কিন্তু পুলিশ তাকে সেই সুযোগ দেয়নি। অবশেষে একখানি মাত্র বই তাকে পড়তে দেওয়া হয়। সেই বইটি হল গীতা। এই গীতার শ্লোকের ভেতর থেকে সেদিন অরবিন্দ সেই কারাগারের মধ্যে তাঁর জীবনের সর্বোত্তম পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। গীতাতে ভগবান বলেছেন সকল কর্ম, সকল ধর্ম, ত্যাগ করে আমাকে বিশ্বাস করো, আমাতেই নির্ভর কর, আমি তোমাকে সকল বিপদের হাত থেকে মুক্ত করব। ভগবানের সেই উক্তিকে সেই মহৎ আশ্বাসকে শ্রী অরবিন্দ মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনা, যোগের মধ্যে দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে ছেড়ে দিলেন এবং নির্জন কারাগারে তাঁর তপস্যার একনিষ্ঠতার মধ্যে তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর কারাবাস কাহিনীতে নিজেই লিখেছেন যে সেই সময় তিনি প্রত্যেক বস্তুতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করতেন। শ্রী অরবিন্দের মনে এই যে গভীর পরিবর্তন হচ্ছিল তার খবর কিন্তু বাইরের কেউ জানতেন না। আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় যখন তিনি আসতেন তখন স্থির দৃষ্টি নিয়ে বসে থাকতেন, যেন সেই আদালত, উকিল, বচসা এই সবকিছু সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। আদালতে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হলেন অবশেষে বিচারক শ্রী অরবিন্দকে মুক্তি দিলেন। শ্রী অরবিন্দ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতীয়তার বাণী, ভারত সাধনার কথা আবার লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি জানতে পারলেন যে ব্রিটিশ শাসক তাঁকে আবার বন্দী করার আয়োজন করছে। সেই খবর পেয়ে তিনি বিন্দুমাত্র দেরি না করে গোপনে গঙ্গা পথে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে চলে গেলেন। সেখানে মতিলাল রায় তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন ফরাসি অধিকৃত পন্ডিচেরিতে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি বাংলা ত্যাগ করে পন্ডিচেরি চলে যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।

বাংলা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ রাজনীতির সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন। তার জীবনের ধারা এক বৃহত্তর সাধনার ক্ষেত্রে প্রবাহিত হতে শুরু করে। পন্ডিচেরিতে তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে তাঁর নিজের ঘরে সাধনায় বসলেন। মানুষের জগতের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ যোগ সম্পর্ক সেদিন থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তিনি ভগবান বুদ্ধের মতন শপথ গ্রহণ করলেন যে যতক্ষণ না সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবেন ততক্ষণ তিনি আসন ত্যাগ করবেন না। এইভাবে তিনি এক কঠোর সাধনায় লিপ্ত হয়ে সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্য যে ধ্রুব পথের সন্ধান পেয়েছেন, সে কথাই তিনি তার জগৎবিখ্যাত বই 'The Life Divine' - এ লিখে গেছেন। শ্রী অরবিন্দ বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ভারতের ঋষিদের পুরাতন বিশ্বাসকে আবার ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের সমস্ত কাজের আড়ালে রয়েছে এক অদৃশ্য মহাশক্তি। যখন আমরা সেই অদৃশ্য মহাশক্তির সঙ্গে আমাদের মনের সংযোগ করতে পারি তখনই আমরা প্রকৃত জ্ঞানলাভ করি। যে উপায়ে এই সংযোগ স্থাপন করা যায় তাকেই বলে যোগ। সাধনার সাহায্যে সেই অদৃশ্য মহাশক্তি সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেছিলেন। জগতে যীশু, বুদ্ধ প্রভৃতি কত বড় বড় ধর্ম সাধকেরা জন্মগ্রহণ করেছেন শত শত ধর্মগ্রন্থ লেখা হয়েছে কিন্তু তবু মানুষের দুঃখ দূর হয়নি। মানুষ যত এগিয়ে চলেছে তার দুঃখ- কষ্ট-বেদনাও ততই বেড়ে চলেছে। ধর্ম যদি সত্য হয় তবে মানুষের দুঃখ কষ্ট কেন কমে না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করাই ছিল শ্রী অরবিন্দের সাধনার লক্ষ্য। তিনি বলেছেন বিবর্তনের ধারা যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে বিবর্তনের কাজ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। সে আজও তার নির্দিষ্ট পথে সৃষ্টি করে চলেছে। একদিন মানুষ পশুস্তরে ছিল তারপর সে ক্রমশই উন্নত জীবের পরিণত হয়েছে। তেমনি এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের চেয়ে উন্নততর আর এক শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব হবে, তাদের থাকবে মানুষের মনের চেয়েও উন্নততর আর এক যন্ত্র। তিনি সেই উন্নততর মনের নাম দিয়েছেন অতিমানস। তাই যেদিন মানুষ অতিমানসের সৃষ্টি করতে পারবে, সেদিন মানুষ এই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 506 - 513
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। অরবিন্দ নিজের সাধনা দিয়ে সেই সত্যকে প্রসারিত করেছেন। তিনি শুধু বাংলার বা ভারতবর্ষের কথাই ভাবেননি তিনি ভেবেছেন বিশ্ব মানবের কল্যাণের কথা।

সমকালীন ভারতীয় দর্শন চর্চার ইতিহাসে শ্রী অরবিন্দের দর্শন চর্চা এবং তার পূর্ণযোগের ধারণা এক নতুন দিগন্তের দিশা প্রদর্শন করেছিল। তাঁর দর্শনে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের বিশেষত যোগ দর্শন ও অদ্বৈত বেদান্তের চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়। তিনি এই সমস্ত দার্শনিক চিন্তাভাবনাকে পুনঃসংগঠিত ও পুনঃবিশ্লেষণ-এর মাধ্যমে নিজের দর্শনে এক নতুন সমন্বয়ী চিন্তাধারার সূচনা করেছিলেন। শ্রী অরবিন্দের দর্শনকে একদিকে যেমন ভাববাদী দর্শন বলা হয়, আবার অন্যদিকে তার দর্শনকে পূর্ণঅদ্বৈত-ও বলা হয়। তবে তার এই পূর্ণ-অদ্বৈতবাদ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ থেকে ভিন্ন ধরনের।[১]

'যোগ' শব্দের সাধারণ অর্থ যুক্ত হওয়া। ভারতীয় আধ্যাত্মবাদী দর্শনের অন্যতম প্রভাবশালী দর্শন হল যোগ দর্শন। এই দর্শনের সূত্রকার হলেন মহর্ষি পতঞ্জলি। তিনি তাঁর দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও 'যোগ' বলতে 'ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া'- একথা বোঝাননি। যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' অর্থাৎ যোগ হল চিত্ত বৃত্তির নিরোধ। চিত্ত বলতে বোঝানো হয়েছে বুদ্ধি, অহংকার ও মন- এই তিন তত্ত্বকে একত্রে। যখন এই চিত্ত কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিষয়ের আকার গ্রহণ করে, তখন চিত্তের এই বিষয়াকার গ্রহণ করাকেই চিত্তবৃত্তি বলে। চিত্ত ইন্দ্রিয় ও মনের মাধ্যমে ঘটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঘটের আকার গ্রহণ করে বা ঘটাকার বৃত্তি হয়। আত্মা হল স্বরূপত বিশুদ্ধ চৈতন্য, এই চৈতন্যের বিকার ঘটে না। তাই চিত্তে যে আত্মা প্রতিবিম্বিত হয়, তার-ই বিকার ঘটে। সেই আত্মা অবিদ্যার কারণে নিজেকে সব কিছুর জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। একেই বলে আত্মার বদ্ধ অবস্থা। এই অবস্থায় আত্মা পঞ্চ ক্লেশের দ্বারা ক্লিষ্ট হয়। আত্মার এইরকম অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রয়োজন। চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হলে আত্মা বৃত্তিহীন হয়ে পড়ে। চিত্তের এরূপ অবস্থাকেই 'সমাধি' বা 'যোগ' বলে। আবার এই অবস্থাকে মুক্তি বা কৈবল্যের অবস্থাও বলা হয়।

শ্রী অরবিন্দের মতে, ব্যক্তি যোগের মাধ্যমে দিব্য চিৎ শক্তিকে গ্রহণ করার উপযোগী হয়ে ওঠে। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিজের 'আমিত্ব'কে বর্জন করা। আর যদি সেটা করা সম্ভব হয়, তাহলে ক্রমশই আমাদের এই সমাজটা হয়ে উঠবে দিব্য মানব সমাজ।

ভারতীয় যোগ চর্চার প্রসঙ্গ আসলেই সবার প্রথমে সন্ন্যাসের আদর্শের কথা আসে। কর্ম, সংসার, মায়াময় জগত ছেড়ে নির্জন অরণ্য বা পর্বতের অন্ধকার গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে জীবনের পূর্ণতম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে থাকার প্রসঙ্গও আসে।

বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ নির্বাণের কথা বলেছিলেন। নির্বাণ হল আত্মার মুক্তি। এ হল সুখ-দুঃখ ও কামনা-বাসনার উর্ধ্বে এমন এক অবস্থা, যেখানে পৌঁছালে পাওয়া যায় অপার শান্তি ও অখণ্ড সুখ। নির্বাণ লাভ করলে আর জন্ম হয় না। কাজেই, কর্মফলজনিত পুনর্জন্ম রোধ করে দুঃখের থেকে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র পথ হল নির্বাণ লাভ করা।

শংকরাচার্যের মতে, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। শংকরাচার্যের ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, কখনোই বুদ্ধদেবের নির্বাণের মতো মহাশূন্যমাত্র নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শংকরাচার্য ও বুদ্ধদেবের মতের মধ্যে কোথাও একটা মিল লক্ষ্য করা যায়। শঙ্করাচার্যও জীবনের অন্তে ব্রহ্মের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া বা ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মার অভিন্নতা উপলব্ধি করার কথা বলেছেন। তবে, সেই অবস্থায় পৌঁছাতে গেলে এমন উপলব্ধি করতে হবে যে, জীবন যেন কেবলই মরীচিকার পিছনে ছুটে যাওয়া এবং জগৎ শুধুই মিথ্যা মায়ার সৃষ্টি। যদিও শঙ্করাচার্য জীবনমুক্তি স্বীকার করেছিলেন। তবে জীবন মুক্ত পুরুষ সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হন না। তিনি অনাসক্ত ও নির্লিপ্তভাবে জীবন যাপন করেন এবং বদ্ধ জীবের হিতার্থে নিষ্কাম কর্ম করেন। অন্যদিকে দেহের বিনাশের পর যে মুক্তি লাভ হয়, তাকে বলা হয় বিদেহ মুক্তি। প্রারুব্ধ কর্মফল নিঃশেষিত হলে মুক্ত পুরুষের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পুরুষ বিদেহ মুক্তি লাভ করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 506 - 513
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রামানুজ জীব ও জগৎ - দুটোই স্বীকার করেছেন। এই দুই হল পরমেশ্বরের বিশেষণ, যা পরমেশ্বরের ওপরই নির্ভরশীল। রামানুজের মতে মানব জীবনের চরম লক্ষ্য হল সংসার ও ইহজীবন থেকে মুক্তি লাভ করে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা।

ভারতীয় দর্শনে যোগচর্চার অর্থ হল অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করার প্রচেষ্টা। যদিও তা সকলের কাছে সহজ বিষয় নয়। কিন্তু শ্রী অরবিন্দ যে যোগের কথা বলেছেন, তা প্রত্যেকের কাছেই অনুসরণযোগ্য হওয়া সম্ভব। সেই কারণেই তিনি পতঞ্জলি যোগ দর্শনের প্রাণায়াম, আসন অথবা বিভিন্ন প্রকার শ্বাস-প্রশ্বাস ও দেহের ব্যায়াম সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রদান করেননি। এছাড়া তিনি মন্ত্র উচ্চারণের বিষয়েও প্রাধান্য দেননি। শ্রী অরবিন্দের মতে 'যোগ' হল ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, যা অতিজাগতিক অথবা জাগতিক অথবা একান্ত ব্যক্তিগত অথবা তিনটিই একসঙ্গে হতে পারে। তাই তার যোগকে বলা হয় পূর্ণযোগ। এই পূর্ণ যোগ হল অন্তরের যোগ। এক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজন কিছু নিয়ম-নিষ্ঠা, আধ্যাত্মিক চেতনা ও পবিত্রতা, যা সকলের পক্ষেই সহজে অনুশীলনীয়।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দার্শনিকদের মতে, সাধারণত যোগের মাধ্যমে ব্যক্তির বিবেক জ্ঞান জাগ্রত হয় এবং এর ফলে ব্যক্তি আত্মা থেকে অনাত্মাকে পৃথক করতে পারে। কিন্তু শ্রী অরবিন্দ এই পৃথকীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি অনাত্মাকে আত্মায় উন্নীত করায় বিশ্বাসী ছিলেন। এছাড়া অনেক দার্শনিকের মতকে অস্বীকার করে তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে, যোগের লক্ষ্য দেহকে পুরোপুরি বাতিল না করে দিয়ে দেহকে অতিমানসের আলোয় আলোকিত করা।

বিভিন্ন যোগীরা মনে করেন, মানুষ যখন যোগের মাধ্যমে সমাধি অবস্থা লাভ করে, তখন সমস্ত জাগ্রত চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী জগতের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু শ্রী অরবিন্দ ঐশ্বরিক সত্তার সঙ্গে সংযুক্তিকরণ আমাদের জাগ্রত চেতনার মাধ্যমেই সম্ভব বলে মনে করেছেন। শ্রী অরবিন্দের মতে, যোগ কখনোই জীবনকে প্রত্যাখ্যানের যোগ নয়, বরং এই যোগ হল সাধকের সঙ্গে পরম ঈশ্বরের সামীপ্য।

শ্রী অরবিন্দের সাধনার লক্ষ্য হল পরমাত্মার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করে অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান হওয়া এবং মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত দেবত্ববোধ আছে, তাকে জাগিয়ে তোলা। তিনি মনে করতেন, এইভাবেই সমগ্র মানবজাতি দিব্য জীবনের অধিকারী হয়ে উঠবে।

শংকরাচার্যের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, কিন্তু শ্রী অরবিন্দের মতে ব্রহ্মসত্য, জগৎ-ও সত্য; মিথ্যা হল কেবলমাত্র অহংকারের বশবর্তী হয়ে জগতের প্রতি আমাদের আসক্তি। তাই ত্যাগ করতে হবে আসক্তিকে এবং কর্মফল লাভের স্পৃহাকেও সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে। সমস্ত কর্মফল ও অহংকার ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করে দিতে হবে। ভগবত গীতার মূল আদর্শও অজ্ঞান ও অহংকার ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম পালন করা। বৈদিক ঋষি রাও একইভাবে কর্মযোগের আদর্শকেই সমর্থন করেছেন। শ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে, এইভাবে উৎসর্গ ও আত্ম বলিদানের মাধ্যমেই ঈশ্বর মানুষের মাঝে অবতীর্ণ হবেন এবং সেই প্রচেষ্টাতেই তিনি সারা জীবন ব্যাপী সাধনা করে গেছেন। পরমেশ্বর-এর কাছে এই আত্মসমর্পণই হল শ্রী অরবিন্দের পূর্ণযোগের মূল লক্ষ্য।

'মায়া' শব্দের দুটি অর্থ। প্রথম অর্থ অনুযায়ী মায়া হল এক প্রকার শক্তি, যা গঠনমূলক ও সৃষ্টিমূলক। আর দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী মায়া হল ভ্রম সৃষ্টিকারী পদ্ধতি। শ্রী অরবিন্দ মায়াকে দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করেননি। যদি তিনি মায়াকে দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করতেন তাহলে সমস্ত জগৎ ভ্রমাত্মক হয়ে যেত। তিনি জগতকে অসত্য বা মিথ্যা বলেননি। সেক্ষেত্রে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শ্রী অরবিন্দ মায়ার প্রসঙ্গে প্রথম অর্থটি স্বীকার করেছিলেন। তাই মায়া হল এমন শক্তি যা জগত সৃষ্টি করেছে এবং একে দিব্য মায়াও বলা যেতে পারে।

শ্রী অরবিন্দ আত্মচেতনাকে মানুষের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বলেছেন। এই 'আমি'র অস্তিত্ব রয়েছে অন্তঃস্থলে। মানুষের যথার্থ দিব্য সত্তা হল এই অন্তঃসত্তা। বাহ্য সত্তার অস্তিত্বকে অতিক্রম করলেই এই অন্তঃসত্তার হদিশ মেলে। তবে এই উপলব্ধি কখনোই রাজযোগ বা হঠযোগ বা কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগের মাধ্যমে সম্ভব নয়। কারণ এই সমস্ত যোগেরই সীমাবদ্ধতা আছে। তাই এই অন্তঃসত্তার উপলব্ধি একমাত্র পূর্ণযোগের মাধ্যমেই সম্ভব। পূর্ণযোগই একমাত্র অসীম সম্ভাবনাময়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 506 - 513
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পূর্ণযোগীর সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হল নিজেকে পরমেশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হবে। এক্ষেত্রে যোগীর আত্মসমর্পণ নিঃশর্ত হবে। এছাড়া যোগীকে ঈশ্বর কৃপা লাভ করার মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে হবে। সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে। কিন্তু কর্মফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করলেও যোগী কিন্তু কর্ম থেকে বিরত থাকবেন না। তিনি কেবল কর্তব্যবোধ থেকে কর্ম করবেন এবং সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করবেন। তাই—

> "পূর্ণযোগের চেষ্টা হইল জ্ঞানের যুপকাষ্ঠে কর্মকে বলিদান করা নয়, জ্ঞানের আলোতে কর্মকে রূপান্তরিত করা; ব্রহ্মলাভের আগ্রহে জগৎকে উপেক্ষা করা নয়, ব্রহ্মের বলে বলীয়ান হইয়া জগতে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করা; নির্বাণের অধীর আকাঙ্ক্ষায় জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত করা নয়, নির্বাণলব্ধ প্রেম ও মৈত্রীর ভিত্তিতে পার্থিব জীবনকেই অমৃতময় করিয়া তোলা।"[২]

শ্রী অরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগকে সমন্বয়ী যোগও বলেছেন। কেননা এই যোগে সমস্ত রকম যোগের সমন্বয় ঘটেছে। এক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যা অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। যেমন, হঠযোগে দেহের শৃঙ্খলার ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, রাজযোগে মনকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, আবার জ্ঞানযোগে জ্ঞানের ওপর, ভক্তিযোগে ভক্তির ওপর এবং কর্মযোগে কর্মের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই বিভিন্ন প্রকার যোগ পরস্পর বিরোধী না হলেও এরা নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অন্যের মতকে মোটেও গুরুত্ব দেননি। শ্রী অরবিন্দ এই বিষয়টি অনুভব করেই তাঁর সমন্বয়ী পূর্ণযোগের কথা বলেছিলেন।

অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক রা মনে করতেন, একক ব্যক্তির মুক্তি হল যোগ এর মূল লক্ষ্য। কিন্তু শ্রী অরবিন্দ মনে করতেন, এটা কখনোই যোগের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। যোগের চরম লক্ষ্যের একটি দিক একক ব্যক্তির মুক্তি হলেও, যোগের প্রকৃত চরম লক্ষ্য হল সমগ্র মানবজাতির পুনরুদ্ধার করে পৃথিবীতে দিব্য জীবনের সূচনা করা।

পৃথিবীতে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই তা লৌকিক উপায় করতে হবে, যা একমাত্র পূর্ণযোগের দ্বারাই সম্ভব হবে। পূর্ণযোগের অনুশীলনের দ্বারা সাধক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন এবং অতিমানস চেতনার স্তরে উন্নীত হতে পারেন। এর ফলে তিনি নিজের মুক্তির পথে এক ধাপ অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু এইভাবে একক ব্যক্তির মুক্তি হলেও জগতের কোন কল্যাণ হয় না। শ্রী অরবিন্দ তাই অতিমানসকে ধরাধামে নিয়ে আসার কথা বলেছেন। তিনি ব্যক্তির মুক্তির পরিবর্তে সমষ্টির মুক্তির কথা বলেছিলেন।

শ্রী অরবিন্দের দর্শনে আমরা বেদ-উপনিষদের পরম জ্ঞানের প্রতিফলন দেখতে পাই। তবে তিনি বাস্তব বা পার্থিব জগতকে উপেক্ষা করার কথা কোথাও বলেননি। তিনি কেবল বলেছিলেন রূপান্তরের কথা; সবকিছু কে নতুন প্রাণ ও নতুন আকার দেওয়ার কথা। এর জন্য প্রয়োজন হল দৈহিক, মানসিক ও সত্তাগত পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন করা সম্ভব একমাত্র পূর্ণযোগের দ্বারা। শ্রী অরবিন্দ 'পূর্ণযোগ'এ পূর্ণতা বলতে বোঝোন ভাগবত পূর্ণতা, আত্মার পূর্ণতা। এই অর্থে, "পূর্ণতা ভাগবত সত্তার স্বরূপ, ভাগবতী প্রকৃতির ধর্ম।"[৩]

শ্রী অরবিন্দের পূর্ণযোগ হল তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা। তবে পূর্ণযোগ এবং তার সাহায্যে পৃথিবীতে দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠা করা- এই সবই হল অনুশীলন করার বিষয়, কখনোই কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় নয়। তাই একমাত্র অনুশীলনের মাধ্যমেই এই আধ্যাত্মিকতার যথার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব। শ্রী অরবিন্দ বলেন,

> "পূর্ণযোগ আরোহণ ও অবরোহণের দ্বয়ী গতিস্বরূপ।"[৪]

একদিকে যোগী যেমন আধ্যাত্ম-উপলব্ধির সমুচ্চশিখরে উঠে যাবেন, অপরদিকে আবার তৃরীয় লোক থেকে সচ্চিদানন্দের বিজ্ঞান শক্তিকে নামিয়ে এনে কার্যকরী করবেন আমাদের সত্তার নিম্ন স্তর সমূহে।

সূর্য যেমন বহু দূরে থাকে তবু তার আলোর স্পর্শে পৃথিবীতে ফুল ফোটে, জীবন পায়ে জীবনী শক্তি তেমনি সূর্যের মতোই আজও আমাদের মধ্যে আছেন শ্রী অরবিন্দ। তিনি আজও অমর। তাঁর সাধনার আলোর স্পর্শে আজ আমাদের সভ্যতা নতুন প্রাণশক্তিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সেদিন থেকে তিনি তাঁর নির্দিষ্ট ঘরের বাইরে আর বেরিয়ে আসেননি। কেউ তাঁর দেখা পেত না। তাঁর জীবনের শেষের দিকে প্রতিবছরে মাত্র তিন দিন তিনি দর্শন দিতেন। এই তিনটে দিন তার ভক্তরা তাকে দর্শন করতে আসতো। তিনি কারোর সঙ্গে কোন কথা বলতেন না, শুধু নীরবে দর্শন প্রার্থীদের শ্রদ্ধা

গ্রহণ করতেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে নভেম্বর অরবিন্দ তার ভক্তগণকে শেষ দর্শন দেন। নির্ধারিত সময়ের বহু আগেই দেশ-বিদেশের বহু দর্শনার্থী এসে আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিল। তারা নিরবে সারিবদ্ধ হয়ে শ্রদ্ধা অবনতভাবে শ্রী অরবিন্দের বাইরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলো। বেলা দেড়টার সময় শ্রী অরবিন্দ বাইরে এলেন বেলা পৌনে চারটে পর্যন্ত দর্শন পর্ব চলল। ভক্তরা আশ্চর্য ভাবে দেখলেন যে দীর্ঘ ২৪ বছরের সাধনার ফলে বহু পরিবর্তন ঘটেছে শ্রী অরবিন্দের মধ্যে। তার চুল দাড়ি সমস্ত সাদা হয়ে গেছে, গায়ের রং হয়েছে রক্তাভ অথচ ফর্সা। দর্শন দিতে দিতেই অরবিন্দ সমাধিস্থ হয়ে পড়েন এবং সমাধির মধ্যেই তিনি অসুস্থ হন। এরপর কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর ৫ই ডিসেম্বর 1950 সালে রাত ১টা ২৫ মিনিটে শ্রী অরবিন্দের দেহাবসান ঘটে। বিপ্লবী ঋষি শ্রী অরবিন্দ তাঁর পার্থীব দেহ ত্যাগ করে লীন হয়ে যান পরম লোকে। তাঁর শবদেহ মৃত্যুর ৫ দিন পরে পন্ডিচেরি আশ্রমের একটি প্রাঙ্গনে সার্ভিস ট্রি বা সেবা বৃক্ষের নিচে সমাহিত করা হয়। এই কদিন তার দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে এবং তা থেকে এক দিব্যজ্যোতি যেন বিচ্ছুরিত হতে থাকে।

শ্রী অরবিন্দ আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তার অমর আত্মা আজও মিশে আছে সারা পৃথিবীতে। যে সাধনার প্রদীপ তিনি জেনে গেছেন, তা যুগে যুগে আমাদের আলোকিত করবে। তিনি যে দিব্য জীবন ও দিব্য মানব সমাজের স্বপ্ন রচনা করেছেন, সেই স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হওয়া দরকার এখন সকলের।[৫]

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, শ্রী বলরাম প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৮৮
২. বসু, শ্রীসত্যকুমার, সম্পা, শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা, ১৯৭২), পৃ. ১৬৮
৩. শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনা, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, পৃ. ২২৬
৪. শ্রী অরবিন্দ, The Riddle of This World, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ২য় সং, ১৯৯৬, পৃ. ২
৫. সেনাপতি, উমা, শ্রী অরবিন্দের জীবন, কর্ম, দর্শন ও দিব্য জীবন, কলকাতা, সরলা আর্টপ্রেস, ২০১৪, পৃ. ৭০

Bibliography:

শ্রী অরবিন্দ, দিব্য জীবন, (অনুবাদক- অনির্বাণ), পন্ডিচেরী, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, ২০১৩
রায়, সুনীল, শ্রী অরবিন্দের দর্শন মন্থনে, রাজবাটী, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০০৯
বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, শ্রী বলরাম প্রকাশনী, ২০০৫
চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ, বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শনচর্চা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০২০
শ্রী অরবিন্দ মন্দির বর্তিকা, কলকাতা: শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দির, আগস্ট ২০০২
চৌধুরী, হরিদাস, শ্রী অরবিন্দের সাধনা, শৃন্বন্তু, সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, কলকাতা, শ্রী অরবিন্দ ভবন,
শ্রী অরবিন্দ, নিজের কথা, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, পন্ডিচেরি: অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট, ১৯৫৭
শ্রী অরবিন্দ, যোগ সমন্বয়, (অনুবাদক- শ্রী শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়), পন্ডিচেরি, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, ১৯৯১
অনির্বাণ, শ্রীমৎ, যোগ সমন্বয়-প্রসঙ্গ, কলকাতা, শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দির, ২০১৩ (তৃতীয় প্রকাশ)
শ্রী অরবিন্দ, আত্মজীবনীমূলক কথা, পন্ডিচেরি, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, ২০১৮ (তৃতীয় মুদ্রণ)
বসু, শ্রীসত্যকুমার, সম্পা, শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা, ১৯৭২
শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, পুনর্মুদ্রণ, ২০০১
শ্রীঅরবিন্দ, The Riddle of This World, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ১৯৯৬ (২য় সং)
সেনাপতি, উমা, শ্রী অরবিন্দের জীবন, কর্ম, দর্শন ও দিব্য জীবন, কলকাতা, সরলা আর্টপ্রেস, ২০১৪